৩৯৪
(শ্রীমতী মৃণালিনী বসুকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

দেওঘর, বৈদ্যনাথ
৩ জানুয়ারী, ১৮৯৯

মা,

তোমার পত্রে কয়েকটি অতি গুরুতর প্রশ্নের সমুত্থান হইয়াছি। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি।

১। ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্মরক্ষার জন্য আপনা-আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র। আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী-অতি-অহিতকর উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায় বাঁচেন, তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

যথা, আমাদের দেশে বিধবা-বিবাহ-প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি বা দুষ্ট পুরুষেরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছে। পুরুষজাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক আবশ্যকতার সহায়-অবলমম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুটি অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক-একটির এক-একটি পাত্র মিলাই কঠিন, এক-এক জনের দুই-তিনটি কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক পক্ষের হানি করিয়াছে, অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে, তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটি কুমারী পতি পাইবে না। যে-সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা কম, তাহাদের পূর্বোক্ত বাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

ঐ প্রকার জাতিভেদ-বিষয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক আচার সম্বন্ধেও।

পাশ্চাত্যদেশে ঐ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইতেছে।

ঐ প্রকার যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটি প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটি পরিবর্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটি আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কাজ হইবে না।

২। এক্ষণে কথা এই: সমাজ এই যে-সকল নিয়ম করে, অথবা সমাজ যে সংগঠিত হয়, তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন, হাঁ; আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন, তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিমান হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্ব-কামনা পূর্ণ করে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় ভয় আছে, এ কথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা সে প্রকার ব্যবহার করিতে পারিব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার; এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনের -- সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাঁহারা বলেন, অজ্ঞ বা গরিবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদের ধনী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায় জ্ঞানার্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি এ কথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও এ কথা শুনিয়াছি -- 'ছোটলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকুরি কে করিবে?'

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নরনারী অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!!!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত!!!

আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্' -- আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে -- শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরম পুরুষার্থ। যে-সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে-সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

৩। এ জন্মে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃগ্‌গুণাদিসম্পন্ন না হইলেও ব্যক্তি-বিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা পূর্বজন্মজনিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৪। ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটি বড়ই সুন্দর এবং ঐটিই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্মের ইহাই সার -- বাসনার বিনাশ, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় ইচ্ছারো বিনাশ হইল; কারণ বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নামমাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটি ধর্ম বলেন যে অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত, সত্যের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে অবশ্যই পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল; তাহার নাশই শ্রেয়ঃ, কিন্তু মশা মারিতে মানুষ মারার মতো বৌদ্ধাদি মতে দুঃখ নাশ করিতে নিজেকেও নাশ করিয়া ফেলিলাম।

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্ন পরিণাম।

নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপ নিম্ন পরিণামের ত্যাগ এবং উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। ঐরূপ [অবস্থা] মনোবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার ঐ উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্বাণ যাহাই বল, মনোবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়, যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়, যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্ন পরিণাম, এজন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কামভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটিই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।

৫। গুরুমূর্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্টমূর্তি বসাইতে হয়। এ-স্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য।

মনুষ্যে ঈশ্বর-আরোপ বড়ই মুশকিল; কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যে তিনি আছেন, সে জানুক বা না জানুক; তোমার ভক্তিতে সেই ঈশ্বরত্ব-উদয় তাহার মধ্যে হইবেই হইবে।

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ